নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃঃ ৬১-৭৫

© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা*

নারীর আত্ম নির্মাণে 'এজেন্সি' ও সামাজিক 'পুঁজি'র ধারণায়ন

১. ভূমিকা

বর্তমান সময়ে নারীর আত্ম নির্মাণ ও তার সক্রিয়তা অনুধাবনে একটি আলোচিত ক্ষেত্র হলো নারীর 'agency'[১] বিশ্লেষণ। কেননা এজেন্সির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে সত্তার আত্ম-পরিচিতি এবং আত্ম-নির্মাণের প্রেক্ষাপট। প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই তার নিজ নিজ আত্মগঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিসরে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। তাই ব্যক্তির আত্ম নির্মাণের প্রেক্ষিত অনুধাবনে তার সক্রিয়তাকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। কোন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি তার আত্ম নির্মাণে সক্রিয় হয়ে উঠে, আর কোন প্রেক্ষাপটে নয় তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সত্তার আত্ম প্রত্যয়নের রাজনীতি। অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে তার চিন্তা ও মননে নিজ সত্তাকে অনুধাবনের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হলো তার 'সামাজিক সম্পর্ক'। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার নিজ সত্তার বিকাশ ঘটায় এবং নিজস্ব আত্ম নির্মাণে সচেষ্ট হয়। তাই সামাজিক সম্পর্কের আদলে গড়ে উঠে 'সামাজিক পুঁজি'[২] এর ব্যবহার সত্তার আত্মগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সাথে ব্যক্তির নিজ নিজ গুণাবলী ও দক্ষতা তথা তার 'সাংস্কৃতিক পুঁজি'[৩] ব্যবহার তাকে তার আত্ম মূল্যায়নে প্রভাবিত করে। ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে ব্যবহৃত এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি, ব্যক্তিকে তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় এবং সত্তার আত্মনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে তাকে উৎসাহিত করে। তাই ব্যক্তি সত্তার 'এজেন্সি' বিশ্লেষণে, ব্যক্তির অপরাপর সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেমন জরুরি, তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির ব্যবহার কীভাবে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাবিত করে সেটি অনুধাবন করাও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এজেন্সি ধারণায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্যকারী পরিসর হলো নারীর স্বক্রিয়তাকে দেখা। তাই এজেন্সিকে নারীবাদী তত্ত্ব ও চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদবাচ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নারীবাদের যাত্রার শুরুর দিকে নারীকে সাধারণত 'নিষ্ক্রিয় সত্তা' হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যা পরবর্তীতে সমস্যাজনক হিসাবে চিহ্নিত হয়। এরই সূত্রে পরবর্তী পর্যায়ে নারীর স্বনির্ধারণী অবস্থানকে খুঁজে বের করা নারীবাদী অধ্যয়নের একটি মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। যার প্রেক্ষিতে নারীবাদী চেতনায় এজেন্সি একটি 'লিঙ্গীয় ইস্যু'

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ sksnigdha@gmail.com

হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এজেন্সিকে লিঙ্গীয় সম্পর্ক অনুধাবনের একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহার করা হয় (Ortner 2006)।

আমি এজেন্সিকে মূলত ব্যক্তির সামগ্রিকতার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী। ব্যক্তি মাত্রই একটি সংগঠিত সমাজের অংশ। তাই সামাজিক কাঠামো প্রসঙ্গ তার আত্মগত গঠনের সাথে যুক্ত। তবে কেবল সমাজই নয়, ব্যক্তির চেতনাগত বোধ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এসকল বিষয়ও তার ক্রিয়াশীলতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে আমি মনে করি। তাই ব্যক্তির 'প্রণোদনা' সর্বদাই তার সক্রিয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধু প্রণোদণাই নয়, সমাজ কাঠামোও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অনেক সময় ব্যক্তির 'প্রণোদনা' মূলত সমাজ কাঠামোকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। বিশেষত নারীর এজেন্সি প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বিশেষ ভাবে কার্যকর। নারীর এজেন্সি কেবল তার ইচ্ছা, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ নয় বরং বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর মাঝে স্বনির্ধারণী ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টাও বটে। তাই নারীর সত্তাগত বিশ্লেষণে আমি এজেন্সিকে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে আগ্রহী, যেখানে নারীর এজেন্সি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। একই সাথে নারী তার জীবন বাস্তবতায় প্রেক্ষিতগত ভিন্নতায় এজেন্সির নানাবিধ ধরন অবলম্বনের মধ্য দিয়ে নিজ সত্তার পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

এ প্রবন্ধে আমি মাঠ কর্মের তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে, নারীর এজেন্সি কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে নারীকে প্রতিস্থাপন করে এবং নারীর সত্তা ও এজেন্সির মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। প্রবন্ধটিকে তিনটি পৃথক অংশে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রথম পর্যায়ে এজেন্সি সম্পর্কিত ধারণা সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, 'এজেন্সি' ধারণায়নের নানাবিধ পরিসর আলেচনার মধ্য দিয়ে এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে নারীর আত্ম গঠনে এজেন্সি অধ্যয়নের গুরুত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের সর্বশেষ পর্যায়ে নারীর সত্তা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে, আত্মকৌশল ও সামাজিক সম্পর্কের ব্যবহার কীভাবে পুঁজি আকারে নারীর এজেন্সি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. 'এজেন্সি'র ধারণায়ন

এজেন্সি প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন Anthony Giddens (Ortner 2006)। তিনি এজেন্সি ধারণায়নের মধ্য দিয়ে '**structuration** process'[৪]-এর ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, এজেন্সি মূলত কাঠামোবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোকরণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যা ব্যক্তির নিজস্ব সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিকে তার লক্ষ্য পূরণে স্ব-উদ্যোগী করে তোলে। তাঁর এই আলোচনার সূত্র ধরেই পরবর্তীতে প্র্যাকটিস থিওরিতে এজেন্সি ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আবার অনেকের মতে, পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এজেন্সিকে একটি ভিন্ন পরিসরে প্রতিস্থাপন করে। আর এ কারণেই অনেকেই এজেন্সিকে 'a form of Western individualism' (Sewell, Ortner 2006) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন।

প্রচলিত সজ্ঞা অনুসারে এজেন্সি হলো ব্যক্তির 'ability to act' অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতার যোগ্যতা, যেটিকে Baker (2005) বলেন, "the capacity of an individual to act indepedently & to make their own free choices"।

অর্থাৎ এজেন্সি হলো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কার্য সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তার নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের যোগ্যতা। গিডেন্সের মতে, এজেন্সি সর্বজনবিদিত একটি প্রপঞ্চ, ব্যক্তি মাত্রই এজেন্সির ধারক এবং বাহক, কিন্তু ক্ষমতার পরিসরগত ভিন্নতা ব্যক্তির সামর্থ্যকে এবং কর্মক্ষমতাকে সীমিত করে। তাই কাঠামোগত ভিন্নতা সাপেক্ষে ব্যক্তির এজেন্সির ভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন, সমাজ কাঠামোর কাঠামোকরণ (structuration)[৫] প্রতিনিয়ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন নিয়ম ও চর্চার গঠন ও পুনর্গঠন করে থাকে। ব্যক্তি এই সকল কাঠামোর সাথে নিজেকে যুক্ত করে এবং এর মাধ্যমে তার নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে Sewell (1992) বলেন, এজেন্সি সকল মানুষের মাঝেই নিহিত তবে ব্যক্তির এজেন্সির পেছনে বরাবরই কোন না কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত থাকে। তাই Sewell তাঁর আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে বলেন, "agency as a capacity for desiring, for forming intention & for acting creatively"। অর্থাৎ এজেন্সিকে তিনি দেখছেন ব্যক্তির ইচ্ছা, শক্তি এবং স্বপ্রণোদিত সক্ষমতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এজেন্সিকে এত সাদামাটাভাবে বিশ্লেষণ না করে এর সাথে যুক্ত অপরাপর ক্ষমতা সম্পর্কের প্রসঙ্গটিকেও টেনে আনেন। তিনি বলেন, এজেন্সির কেবল ব্যক্তির সংগঠিত ক্রিয়া নয়, এটির সাথে ব্যক্তির অপরাপর যোগাযোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির এজেন্সি মূলত সমাজ ও সংস্কৃতির ছাঁচে নির্মিত এক ধরণের সক্ষমতা। যেটি আবার 'সক্রিয়তার রাজনীতি' (politics of agency) তথা এজেন্সির সাংস্কৃতিক নির্মাণকে নির্দেশ করে। তবে 'সক্রিয়তার রাজনীতি' বলতে মূলত এজেন্সির সাংস্কৃতিক নির্মাণকে বোঝানো হয়ে থাকে, যেখানে সমাজের কাঠামোকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে উক্ত কাঠামোর মধ্য নিয়ে আসার প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। তাই এজেন্সিকে আবার অনেকেই Gramsci (1972)-এর 'হেজেমনি' ধারণার সাথে যুক্ত করে আলোচনা করেন। এরূপ ধারণায়নে বলা হয়, সমাজের কাঠামোকৃত কর্তৃত্বকে এমন ভাবে ক্রিয়াশীল করে রাখা হয় যে, ব্যক্তি নিজেই সচেতন ভাবে কর্তৃত্ব ও আধিপত্যবাদী কাঠামোকে মেনে নেয় এবং এই সমাজে কাঠামোর কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। গিডেন্সের 'কাঠামোকরণ' ধারণায়নে এইরূপ প্রক্রিয়াতে মূলত এজেন্সিকে চিত্রায়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এজেন্সীর এইরূপ সংজ্ঞায়নে কেবল ক্ষমতা সম্পর্ক ও সমাজ কাঠামো অনুসারে ব্যক্তিকে পরিচালনের প্রক্রিয়া হিসাবেই বর্ণনা করার আশংকা তৈরি হয়, যা এজেন্সি প্রত্যয়নের সামগ্রিকতা প্রকাশে ব্যর্থ বলে মনে করা হয়।

Ortner (2006) বলেন, এজেন্সি হলো ব্যক্তির এক ধরনের 'intentionality'[৬] যার মধ্য দিয়ে সে তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে পূরণ করে এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তির সত্তা এক ধরনের 'স্বীকৃত সামাজিক সত্তা' (authorized social being) হিসাবে কাজ করে। যেটিকে তিনি 'socioculturally mediated capacity to act' হিসাবে সংজ্ঞায়ন করে

থাকেন (Ortner 1996, Ahern 2001)। একইভাবে গিডেন্সও তার আলোচনাতে ইনটেনশনের সাথে পরোক্ষ পরিসরে এজেন্সিকে যুক্ত করেন। তিনি 'intentionality as a process' এর ধারণায়নে বলেন, এটি মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। যার ফলে মানুষ অনেক সময় অবচেতন পরিসরেও তার সচেতনাকে ধারণ করে, তার লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করেন। তাই ব্যক্তির ইচ্ছা ও অনিচ্ছা অনুধাবনের মধ্য দিয়েও তার সত্তার সক্রিয়তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

তাই এজেন্সিকে কেবল একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সমস্যাজনক। এক্ষেত্রে গিডেন্সের 'কাঠামোকরণ' প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে যেভাবে এজেন্সিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে আবার গ্রামসির হেজেমনির ধারণা দ্বারাও এজেন্সিকে প্রত্যয়ন করা যেতে পারে। পাশাপাশি Sewell যেভাবে এজেন্সিকে ব্যক্তির সংগঠিত ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য পূরণের সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেন সেটিও ক্ষেত্র বিশেষে গ্রহণযোগ্য।

৩. নারীর আত্ম নির্মাণে 'এজেন্সি'

সাধারণত নারীবাদী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে একটি দীর্ঘ সময় যাবত নারীকে নিষ্ক্রিয় এক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । কিন্তু বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে আদৌ নারী সর্বদা এরূপ নিষ্ক্রিয়তাকে ধারণ করছে কিনা তা একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। আর নারীর এই নিষ্ক্রিয় ইমেজকে কটাক্ষকরণের সর্বোত্তম উপায় হলো তার এজেন্সিকে তুলে ধরা। সকল স্তরের, সকল পর্যায়ের মানুষের মাঝেই কম বেশি সক্রিয়তা বিদ্যমান। কিন্তু পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা ব্যক্তির সক্রিয়তার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। নারী তার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে থেকেই নিজের উদ্দেশ্য, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে নারী নানাবিধ কৌশলের মধ্য দিয়েও তার সক্রিয়তাকে টিকিয়ে রাখে। একই সাথে সে তার গতিশীলতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজেকে অন্যান্যদের ন্যায় সক্রিয় সত্তা হিসাবে নির্মাণে উৎসাহী হয়ে উঠে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে সত্তা ও তার এজেন্সি অনেক সময় একে অপরকে পরিচালনাও করে। তবে নারীর এজেন্সিকে কেবল তার নিজের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। নারীর এজেন্সির বিশ্লেষণ করতে হলে তাকে তার স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার পারিপার্শ্বিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। একইসাথে ব্যক্তির সক্রিয়তার ভিন্নতা তার আত্মনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের ভিন্নতা তৈরি করে।

সকল নারীর মাঝেই এজেন্সি বিদ্যমান কিন্তু এর ব্যবহার ও প্রায়োগিকতার ভিত্তিতে তার সত্তা নির্মাণের পরিসরগত ভিন্নতা তৈরি হয়। তাই নারীর সক্রিয়তাকে বিশ্লেষণ করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত হতে তা অনুধাবন করতে হবে বলে আমি মনে করি। কেননা ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনা নারীর জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে, যার প্রেক্ষিতে সবসময় চাইলেই যে, সে তার কর্মক্ষমতা অনুসারে কাজ করতে পারে তা নয়। আবার তাই বলে ঐ নারীর যে সক্রিয়তা কম থাকে তাও নয়। তাই গৃহস্থালী ও চারপাশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে অনুধাবন করতে হবে। Bourdieu (1977, 1990) যেভাবে এজেন্সি এবং স্ট্রাকচারকে যুক্ত করে ব্যক্তির

সত্তাকে বিশ্লেষণের কথা বলেন, তা এই আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক। তিনি কাঠামো এবং এজেন্সিকে এক ধরনের পরিপূরক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে এই দুয়ের মাঝে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেন। যেখানে ধারণা করা হয়, কাঠামো ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে আবার ব্যক্তির আচরণও কাঠামোকে পরিবর্তনের যোগ্যতা রাখে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কেসটি উল্লেখ্য:

উম্মে হাবিবা জোৎস্না, বয়স-৪০, বিবাহিত, সরকারী কর্মকর্তা। হাবিবা তার বাবা মায়ের প্রথম সন্তান। তার মা মারা যান, যখন তার বয়স ১৫। সে সময়ে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন, হাবিবার ভাষ্যমতে, তার সৎ মা তাকে নানা ধরনের মানসিক নির্যাতন করতেন, তার (সৎমা) নিজ ছেলেমেয়ের প্রতি তিনি যতটা সচেতন ছিলেন, হাবিবার প্রতি তার সেরকম কোন মনোযোগ ছিল না। পরিবারের এই হেঁয়ালিপনা আর বয়সের দোষেই তিনি ১৬ বছর বয়সেই লিটন নামের এক ছেলের সাথে প্রেম করেন এবং মাত্র এক মাসের প্রেমের সম্পর্কের ভিত্তিতে বাড়ি থেকে পালিয়ে ঐ ছেলেকে বিয়ে করেন। লিটনের সাথে বিয়ের এক মাসের মাথায় হাবিবা অনুভব করেন, এটি তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। হাবিবা তাই বিয়ের ২৮ দিনের দিন রাতের বেলা একাই মানিকগঞ্জ হতে সাভার তাঁর বাবার বাড়ি চলে আসেন। বাবার বাড়ি আসার পর তার বাবা ও চাচা সবাই হাবিবাকে পেয়ে এত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে, সে রাতেই হাবিবা তার জীবনকে গুটিয়ে নেন। সে রাতেই হাবিবা সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি তাঁর জীবনকে যাপন করবেন তাঁর পরিবারের স্বার্থে, তাঁর নিজের জন্য। এদিকে তিনি বাড়িতে আসার পর যে পরিবর্তনটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হলো, তাঁর সৎ মায়ের আচরণ তার প্রতি পুরোপুরি বদলে যায়। তাঁর 'মা' তখন তাঁকে সবচাইতে বেশি আপন করে নেন। আর এর কারণ হিসেবে হাবিবা বলেন: *আমি বিয়ে করার জন্য পালিয়ে গেলে শুনেছি...উনার উপরই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে, উনি আমাকে আদর যত্ন করেন নাই বলেই আমি বাড়ি ছেড়েছি...তাই আত্মীয়স্বজন, আমার বাবা সবাই উনার উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমি ফেরত আসার পর উনি আমার প্রতি এতটাই কেয়ারিং হয়ে যান যে...আজ কিন্তু আর মনেই হয় না উনি আমার সৎ মা।*

বাড়ি আসার তিন মাসের মাঝেই হাবিবার সাথে লিটনের ডিভোর্স হয়ে যায় । লিটনের এই ঘটনা, হাবিবার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর হাবিবা এম.এ. পাশ করেন এবং চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরিতে যোগদান করার পর বাবা মায়ের পছন্দে ১৯৯৯ সালে হাবিবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

হাবিবার এই, কেসটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি দেখতে পাই তা হলো, প্রথমত হাবিবা যখন ১৫ বছর বয়সী কিশোরী তখন থেকেই তিনি তাঁর জীবনের বাস্তবতাকে অনুধাবন করেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঙ্কট হতে উত্তরণের আশায় নিজেকে পরিবর্তনে সক্রিয় হয়ে উঠেন। হাবিবা বাসা ছেড়ে চলে গিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ছিলেন উপেক্ষিত, উপেক্ষা সন্তান হিসেবে তার প্রাপ্য না-পাওয়া। এই উপেক্ষা থেকে মনোযোগ আদায়ে সক্রিয় পদক্ষেপ ছিল তার এই সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে যখন তার ডিভোর্স হয়ে যায় তখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তিনি তাঁর নিজ আত্ম পরিচিতি গড়ে তুলবেন। জীবনকে তিনি নতুনভাবে শুরু করেন। এই ঘটনা তাঁকে নিষ্ক্রিয় নয় বরং আরও সক্রিয় করে তোলে। ১৯৮৫ সালের সমাজ ব্যবস্থায়, মধ্যবিত্ত চৈতন্যে, একটি ১৫ বছর বয়সী মেয়ের

বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, বিয়ে করা এবং বিয়ের এক মাসের মাথায় ফিরে আসা, ডিভোর্স হওয়া এসকল বিষয় কোনভাবেই সমাজের আদর্শ মধ্যবিত্তের মননশীলতা বা চিন্তা জগতে স্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।

এক্ষেত্রে হাবিবা যদিও দাবি করেন যে, তিনি তখন নিজেকে অন্য মেয়েদের মতই ভাবতেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, তিনি তার প্রেক্ষিতগত 'অন্যতাকে' অনেক বেশি অনুধাবন করতেন। তিনি যখন বলেন, তিনি তার ভুল মোচন করতে চান, তখনই এ বিষয়টি অনুভব করা যায়। যেহেতু তিনি এমন এক ঘটনার মধ্য দিয়ে যান, যেখানে সমাজ তাঁকে তৎকালীন বাস্তবতায় নেতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করার আশঙ্কা রাখে, সেহেতু হাবিবা সচেতনভাবেই তার নেতিবাচক 'সামাজিক ইমেজকে' ইতিবাচক রূপদানে সক্রিয় হয়ে উঠেন। যার প্রেক্ষিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার নিজ আত্মপরিচিতি গড়ে তোলার, লেখাপড়া শেষ করার এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার। এক্ষেত্রে হাবিবার এজেন্সিকে আবশ্যিকভাবেই Ortner (2006) এর ন্যায় 'intentionality' বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা হাবিবা খুবই সচেতন ভাবেই তাঁর সক্রিয়তাকে বারংবার তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

অন্যদিকে, হাবিবার সৎ মায়ের আচরণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এক ধরনের সামাজিক চাপ তথা সমাজ কাঠামো তাকে হাবিবার প্রতি তাঁর আচরণের পরিবর্তনে বাধ্য করে যেটিকে Bourdieu তাঁর কাজে পরিপূরক শক্তি (complementary forces) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে থকেন। হাবিবার মায়ের ক্ষেত্রে সমাজ কাঠামো ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করছে। কেননা ১৯৮০-৯০ শতকে মধ্যবিত্ত মননে "সৎ মা" তার সন্তানের প্রতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরূপভাজন হবেন, এটাই ধারণা করা হত এবং হাবিবার মায়ের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য ছিল। তাই হাবিবা যখন বাসা ছেড়ে পালিয়ে যান, তখন সমাজের সকল আক্রোশ গিয়ে পড়ে হাবিবার সৎ মায়ের উপর। সমাজের চাপ, জবাবদিহিতার ভয়, আর তাঁর নিজ অবস্থানকে পুনরায় ফিরে পেতে, স্বামী ও পরিবারের কাছে তাঁর পূর্বেকার মান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তিনি হাবিবার প্রতি দায়িত্ববান হয়ে উঠেন। হাবিবার লেখাপড়া থেকে শুরু করে তার দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যার প্রেক্ষিতে আজ সমাজে, হাবিবার সন্তান, স্বামীর কাছে তার সৎ মা নন বরং 'মা' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার আত্মনির্মাণের উদ্দেশ্যে সচেতন ভাবেই তার সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে নিজ সত্তাকে নির্মাণে ও পুনর্নির্মাণে উদ্যোগী হয়। আবার একইভাবে, ক্ষেত্র বিশেষে সমাজ ও মনোজাগতিক কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যক্তি আচরণ প্রভাবিত হয় এবং সত্তার আত্মগঠন সামাজিক নানা যুক্তিশীলতা দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ব্যক্তির বাস্তবতার ভিন্নতা বা সত্তার অভিজ্ঞতার ভিন্নতা তার আত্মনির্মাণের সক্রিয়তাকে প্রভাবিত করে এবং প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটের ভিন্নতায় ব্যক্তি তার সত্তা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে সক্রিয় হয়ে উঠে।

৪. 'কৌশল ছাড়া মেয়ে মানুষের জীবন অচল'—নারীর আত্মকৌশল ও এজেন্সি

নারীর এজেন্সি কেবল তার সক্রিয় ভূমিকা ও নিজ কর্মক্ষমতার প্রায়োগিকতার সাথেই যুক্ত নয়, এটি তার আত্মনির্মাণের একটি কৌশলও বটে। আমাদের মত সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত নারীকে পুরুষ হতে ভিন্ন কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নারী এখানে কেবল তার লিঙ্গীয় ভিন্নতাকেই ধারণ করে না, মতাদর্শিক ও মনোজাগতিক পরিসরেও নারীকে ভিন্ন ইমেজ দ্বারা চিত্রায়ন করা হয়। এখানে নারীর এজেন্সিকে দেখা হয় নারীর 'গৃহীপনা' ও তার স্বামী সন্তানের দেখভালের ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তবিক পরিসরে নারীর এজেন্সি কেবল তার স্বামী, পরিবার বা সন্তানের সাথেই যুক্ত নয়, এর সাথে নারীর নিজ আত্মনির্মাণের বিষয়টিও সম্পর্কিত থাকে। নারী অনেক সময় তার নিজ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সচেতন ভাবেই বিভিন্ন ধরনের আত্মকৌশল অবলম্বন করে, আর এ সকল আত্মকৌশলের মধ্য দিয়েই সে তার সক্রিয়তার পরিচয়কে তুলে ধরে বলে আমি মনে করি। নারী তার আত্ম অনুধাবনের মধ্য দিয়ে এবং নিজ আত্ম পরিচিতি নির্মাণের তাগিদে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করে। অনেক সময় সচেতনভাবেই নারী তার অধঃস্তনতাকে মেনে নেয়। আর এই মেনে নেয়ার মধ্য দিয়েই সে তার আত্ম পরিচিতিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার তাগিদে বিভিন্ন আত্মকৌশল অবলম্বনে সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই নারীর সক্রিয়তাকে তার আত্মকৌশলের মধ্য দিয়েও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একজন নারী চাইলেও তার পারিপার্শ্বিক সমাজ কাঠামোকে অতিক্রম করে, তার লক্ষ্য বা স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না, তাই প্রায়ই এই কাঠামোর মধ্যে থেকে তার নিজ ইচ্ছা পূরণে উদ্যোগী হতে হয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্ভব হয়ে উঠে নারীর আত্মকৌশল ও তার সক্রিয়াতর মধ্য দিয়ে। যেটিকে Ortner এর ন্যায় বলা হয় 'intentionality' । তাঁর মতে, "the notion of agency as individual intention and desire" (Ortner 2006)।

অর্থাৎ এজেন্সিকে তিনি ব্যক্তির সচেতনতা ও ঐচ্ছিকতার সাথে যুক্ত করে দেখতে চান। আমি অর্টনারের এজেন্সির ধারণাটির সাথে ব্যক্তির আত্মকৌশলের বিষয়টিকে যুক্ত করতে চাচ্ছি। কেননা এই আত্মকৌশল ব্যতীত ব্যক্তির ইনটেনশনকে বিশ্লেষণ করা সমস্যাজনক। তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারী তার ইনটেনশন বা ইচ্ছাকে পূরণের লক্ষ্যে নানা ধরনে কৌশল অবলম্বন করে যার মধ্য দিয়ে সে তার সত্তার সংস্করণ ঘটায় এবং নিজ সত্তার গুরুত্বকে তুলে ধরতে চায়। তাই নারীর এই সকল কৌশলকে আমি আত্মকৌশল হিসাবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী যা নারীকে তার সক্রিয়তার বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে এবং নারীর সত্তা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত জীবনবৃত্তান্তটি প্রাসঙ্গিক হতে পারে:

> শাকিলা পারভীন শিখা, বয়স-৩২, বিবাহিত একজন গৃহিণী। তিনি ১৯৯৩ সালে বৈবাহিক সূত্রে গোপালগঞ্জ হতে ঢাকায় আসেন। তাঁর স্বামী শেখ শফিকুল ইসলাম শফিক একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। শফিকের সাথে শাকিলার যখন বিয়ে হয়, তখন শাকিলার বয়স ছিল ১৫। শফিকের মা সম্পর্কে শাকিলার ফুপু ছিলেন। মূলত ফুপুর চাপেই শাকিলার বাবা শাকিলার সাথে শফিকের বিয়ে দেন। এমনকি শফিকেরও এই বিয়েতে মত ছিল না। শফিক তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন। শফিকের সাথে সে সময় প্রেমা নামের এক মেয়ের ভাব ছিল। শাকিলার ফুপু ও তাঁর শাশুড়ি কোনভাবেই ছেলেকে ঢাকার মেয়ের সাথে বিয়ে দেবেন না। তাই শফিক

যখন মাস্টার্স পরীক্ষার আগে বাড়িতে পরীক্ষার ফিস নিতে আসে তখন তার মা তাঁকে বলেন, *তুই যদি শিখারে বিয়ে না করস আমি গলায় দড়ি দিবো।* শফিক মায়ের কথাকে প্রথমে তেমন পাত্তা দেয় না এবং সে রাতেই ঢাকায় আসতে চাইলে তার মা একটা শিশি নিয়ে দরজার কাছে বসে থাকেন এবং বলেন ঐ শিশিতে বিষ আছে, তুই যদি শিখারে বিয়ে না করিস তবে আমি এই বিষ খাব। সে রাতে শফিক মায়ের মমতা এবং মাকে হারানোর ভয়েই শিখাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। এরপর শিখা ও তার শাশুড়ি ঢাকায় এসে উঠেন। এ সময় মাস্টার্স পরীক্ষা ছিল বলে শফিক কোন ভাবেই তাদের ঢাকায় নিয়ে আসতে চাননি। কিন্তু তারপর তড়িঘরি করেই শিখা ও তার শাশুড়ি ঢাকায় এসে উঠেন। নতুন বাসা নেন। শফিক হল ছেড়ে বাসা থেকে মাস্টার্স পরীক্ষা দেন। এ সময় প্রায়ই শফিক শিখাকে নানা ধরনের অবজ্ঞা করতেন। শিখা বলেন, এ সময় তিনি নিজেকে অনেক পরিবর্তন করে ফেলেন, এ সময় তিনি তার স্বামীকে দিয়ে বাসায় ডিশের লাইন লাগান। শিখার বক্তব্য, ডিশ দেখে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন, ডিশ শুধু দেখেন নাই, এখান থেকেই তিনি শিখেছেন কিভাবে কৌশলী হতে হয়, কৌশল ছাড়া মেয়ে মানুষের জীবন অচল।

তিনি আরো জানান: *আমি যখন স্কুলে যেতাম তখন শফিক আমাকে হাত খরচ দিতো মাসে বারশত টাকা। এই টাকা দিয়ে আমি সোনালী ব্যাংকে পাঁচশত টাকা ডি.পি.এস. খুলেছিলাম। শফিককে জানাইনি। ডি.পি.এস. খোলার জন্য তো আর ও আমাকে টাকা দিতো না, তাই ওকে বলি নাই। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুই আমি করি। যেমন কিছু গয়না-গাটি কিনি, শখে কিনি না, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কিনি। কখন কী কাজে লাগে বলা তো যায় না। ২০০৩ সালে যখন শফিকের ব্যবসায় বড় ধরনের লস হয় তখন আমি ঐ ডি.পি.এস. আর আমার কিছু সঞ্চয় ও গয়না গাটি বেঁচে শফিককে ২ (দুই লক্ষ) টাকা দেই, কিন্তু এমনি এমনি দেই না, আমি তাকে বলি তার গ্রামের ১০ বিঘা জমি আমার নামে করে দেয়ার জন্য, সে দেয়ও। সে সময় তার টাকার খুব দরকার ছিলো।* শিখা বলেন: *আমি সুযোগের পুরা সদব্যবহার করছি। আমার তো নিজের বলে কিছু থাকার দরকার আছে তাই না। আজ যদি শফিকের কিছু হয়ে যায় তখন আমি কোথায় যেয়ে দাঁড়াবো, আমার সন্তানের কী হবে। তাই আমি জমিগুলো আমার নামে করে নেই আর শফিককে ২ (দুই লক্ষ) টাকা দেই।...এরপর থেকেই দেখি শফিকের কাছে আমার কত কদর। এই কদরের জন্যই তো এতকিছু। আমি যা চিন্তা করছিলাম। আমি সেটা আদায় করে নিয়েছি।*

শিখার এইসকল ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, ব্যক্তির সক্রিতার সাথে তার নানাবিধ আত্মকৌশল কীভাবে সম্পর্কিত থাকে। একই সাথে এক্ষেত্রে শুধু নারীর এজেন্সিই কাজ করে না তার 'intention' এবং 'desire' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই Ortner (2006)-এর ন্যায় বলা যেতে যে, ব্যক্তির এজেন্সির সাথে আবশ্যিক ভাবেই একধরনের 'intention' যুক্ত থাকে যা আমরা শিখার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি।

শিখা বরাবরই তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় সক্রিয় হন। এক্ষেত্রে তাঁর 'intention' এবং 'desire' এর বিষয়টি খুবই স্পষ্ট আকারে লক্ষ্য করা যায়। কেননা শিখা তার লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য নিয়েই সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং একইসাথে তিনি বিভিন্ন কৌশলও অবলম্বন করেন। শিখা প্রথম দিকে তার এই সকল আত্মকৌশলের মাধ্যমেই তার স্বামীর মন জয় করেন। স্বামীর মন জয় করার বিষয়টি কোন ভাবেই কেবল শিখার অধঃস্তনতা বা

পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য বলে আমার কাছে মনে হয়নি। সে স্বামীকে তার নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসার জন্যই তার কথা মত চলেন এবং এর মধ্য দিয়েই পরবর্তী পর্যায়ে শিখা তার নিজ সত্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে Alison Jaggar-এর 'concept of alienation'[৭] ধারণাটিকে সমস্যায়িত করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। জ্যাগারের মতে, নারী মাত্রই পুরুষের জন্য নিজেকে তৈরিতে সদা তৎপর এক সত্তা। শিখার কেসটি বিশ্লেষণে, যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো, শিখা তাঁর নিজেকে পুরুষের জন্য তৈরি করে একথা সত্য কিন্তু তার এই তৈরির উদ্দেশ্য থাকে তাঁর নিজ আত্মের অবস্থান তৈরি। কাজেই জ্যাগার যেভাবে বলেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে তার সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এক সত্তাতে পরিণত করে, সেভাবেই কেবল নারীকে বিশ্লেষণ করা সমস্যাজনক। কারণ, শিখা এখানে তাঁর নিজেকে স্বামীর মনের মত করে পরিচালনা করার মধ্য দিয়েই নিজেকে অপারাপর বিষয়বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন করেন না বরং তাঁর সাথে ওতোপ্রতোভাবে নিজেকে যুক্ত করেন। তাই এক্ষেত্রে নারীর বিচ্ছিন্নতা হতে তাঁর সক্রিয়তাকে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নারীকে যদি বিচ্ছিন্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে পুনরায় নারীকে এক ধরনের নিষ্ক্রিয় সত্তা হিসাবে প্রতিস্থাপনের সংকট তৈরি হতে পারে। আমার মতে এটিকে গিডেন্সের কাঠামোকরণ ধারণাটির মধ্য দিয়ে দেখা যেতে পারে। যেখানে সমাজ কাঠামো অনুসারে বিশেষত মধ্যবিত্তের মনন কাঠামো মোতাবেক একজন নারীর কাছে তার স্বামী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে পাকাপোক্ত ও শক্তিশালীকরণে শিখা নানা কৌশল অবলম্বনের মধ্য দিয়ে তার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলে।

৫. নারী আত্ম গঠনে 'পুঁজি'র ব্যবহার

ব্যক্তি সত্তার গঠনে, ব্যক্তির চারপাশে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও নানাবিধ সম্পর্কসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সম্পর্ক মাত্রই ব্যক্তি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। সত্তার আত্মনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে ব্যক্তির এই নানাবিধ সম্পর্ক খুবই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। একই সাথে ব্যক্তির নানাবিধ গুণাবলী, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে তার আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়ে উঠে। সত্তার গঠন কাঠামো হতে শুরু করে তার ব্যক্তিত্ব গঠনের সকল পর্যায়ে, তার গুণাবলী, যোগ্যতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাই সত্তার অনুধাবনে ব্যক্তির নানাবিধ সম্পর্ক, তার দক্ষতা ও গুণাবলীর আদলে বিশ্লেষণ করা জরুরি বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে নারীর সত্তা অনুধাবনে বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কেননা নারীর সক্রিয়তা ও আত্মনির্মাণের সকল পর্যায়ে এ বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। শুধু তাই নয়, নারীর আত্ম গঠন প্রক্রিয়াও ক্ষেত্র বিশেষে তার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তাই নারীর সত্তা নির্মাণে এ বিষয়গুলো পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। মূলত Pierre Bourdeu (2004) ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের এই গুরুত্ব অনুধাবনেই প্রচলিত পুঁজির ধারণায়নের বিপরীতে

সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিসরে 'capital' প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করে থাকেন। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Outline of a Theory of Practice*-এ তিনি প্রভাবশালী মার্ক্সীয় পুঁজি ধারণয়ানের পুরোপুরি ভিন্ন আঙ্গিকে capital এর প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের পুঁজির কথা বলেন। পুঁজিকে তিনি চারটি ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি জীবনের চর্চায় এর প্রায়োগিকতাকে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে আমার কাজের সাথে তাঁর 'সামাজিক' ও 'সাংস্কৃতিক' পুঁজির ধারণাটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

৫.১ স্কুল ও কোচিংয়ের 'ভাবী সম্পর্ক'—বিবাহিত নারীর আত্মনির্মাণে সামাজিক পুঁজির ব্যবহার

নারীর আত্ম নির্মানে তার চার পাশের বিভিন্ন ধরনের পাতানো সামাজিক সম্পর্কসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীর সম্পর্কের এই নেটওয়ার্ক নারীকে সক্রিয় করে তোলে। ইসলাম (অপ্রকাশিত) তার কজে এমনি প্রলক্ষণ গ্রামীণ নারীদের সাথে কাজ করতে যেয়ে দেখতে পান। ব্রাক এর টি,ইউ,পি, প্রোগ্রামের অধীন দরিদ্র নারীরা নিয়মিত মিটিংয়ে আসা যাওয়ার করতে করতে এমনি জোরালো সহযোগী সম্পর্ক তৈরি করেছে যা তার জীবনধারণ কৌশল হয়ে উঠে। জীবন চলার পথে যে কোন সমস্যার সমাধানে কখনো কখনো নিজের পরিবার আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এই পাতানো সম্পর্ক নারীর পথ চলার সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। নারীর নিত্য দিনের জীবন যাপনে এই সকল সম্পর্ক এত বেশি ভূমিকা রাখে যে, নারীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাশীলতা কখনো কখনো তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে। Bourdieu (1979) তার কাজে শিক্ষা এবং 'habitus'-এর ধারণার মধ্য দিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী পুঁজির কার্যকারিতাকে তুলে ধরেন। তিনি মূলত নানাবিধ পাতানো সামাজিক সম্পর্কসমূহ যখন ব্যক্তিকে তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে তাকে 'social capital' বা সামাজিক পুঁজি হিসাবে চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তিনি মূলত প্রচলিত পাতানো সম্পর্কের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সম্পর্ককে এরূপ পুঁজির আওতায় ফেলেন। তাই বন্ধু, সহকর্মী বা প্রতিবেশির সাথে ব্যক্তির যে সামাজিক সম্পর্ক সেটিকে 'social capital' হিসাবে সংজ্ঞায়ন করা যায় কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। ইসলাম (অপ্রকাশিত) দেখিয়েছেন যে, ঢাকার দরিদ্র নারীদের দুঃসহ জীবনের টিঁকে থাকার অন্যমত কৌশল হিসেবে নারীরা নিজ নিজ লিঙ্গ ও শ্রেণীর মধ্যে এমনকি প্রয়োজনে লিঙ্গ ও শ্রেণীর বাইরেও বিভিন্ন সামাজিক সর্ম্পকে দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠা করেন। পরিবার রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ককে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেও, ভাবী সম্মোধনটি নির্দেশ করে বন্ধুত্ব নয় আত্মীয়তাকেই ভাবী সম্পর্কের ভিত্তি মনে করা হয়। সেহেতু এটি আবশ্যিক ভাবেই সামাজিক পুঁজির আওতাভুক্ত করা যায় বলে আমি মনে করি। ঢাকায় বসবাসরত মধ্যবিত্ত বিবাহিত নারীর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিসর হলো স্কুলের 'ভাবী সম্পর্ক'। বর্তমান সময়ে এরূপ সম্পর্ক অনেক বেশি কার্যকর এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই নারীরা শুধু তাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতকে গঠন করছে না, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সকল পর্যায়ে এই সম্পর্ক প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। ঢাকা শহরের স্কুলগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের

তাদের মায়েরাই নিয়ে যায় এবং নিয়ে আসে। শুধু স্কুলেই নয় বিভিন্ন স্যারদের বাসায় বাচ্চাদের পড়াতে তাদের মায়েরাই সাধারণত নিয়ে যায়। এই আসা যাওয়ার মাঝেই গড়ে উঠে এই 'ভাবী' সম্পর্ক। যেখানে কেউ কাউকে পূর্ব হতে না চিনলেও মূহূর্তেই পরিচিত হয়ে উঠে। আর সেখানে এই সম্পর্কের সম্বোধন হলো 'ভাবী'। স্কুলে পরিচিত হলে স্কুলের ভাবী, আর কোচিংয়ে পরিচিত হলে কোচিংয়ের ভাবী। এই ভাবীদের একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রতি সপ্তাহেই দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়। স্যারদের বাসায় ছেলে মেয়েদের পড়তে দিয়ে দেখা যায় হয়ত দুই ঘন্টা বাইরে বসে তাঁরা অপেক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে চলে তথ্যের আদান-প্রদান ও সম্পর্কের প্রগাঢ়করণ। এর সূত্র ধরে এক ভাবী অন্য ভাবীর সহযোগীতে পরিণত হন। শুধু সহযোগীই নয়, কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়ে থাকেন। ভাবীদের মধ্যকার এই সহযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেটাই হোক না কেন তা তার সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে খুবই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাবীদের এই সম্পর্কের নেটওয়ার্ক নারীকে তার আত্ম গঠনের দিকনির্দেশনাও দান করে। ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে সাবলম্বী করে তুলতে যতটা না তার আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার এগিয়ে আসে তার চেয়ে অনেক বেশি সে লাভবান হয় 'ভাবীদের' দ্বারা। ভাবীদের এই আলাপচারিতায় যেমন থাকে 'মেয়েলি' আলোচনা তেমনি থাকে স্বাস্থ্য, সন্তান, জমি জমা, পরিবার এমনকি ব্যবসাকেন্দ্রিক আলাপচারিতা। আর এই আলোচনার উৎস হতেই কখনো কখনো নারীর মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, কখনোবা নারী তার ফেলে আসা স্বপ্নকে নতুনভাবে দেখার সাহস সঞ্চার করে তার নির্মিত সত্তার খণ্ডন করে এবং নতুন ভাবে নিজ সত্তার আত্ম প্রত্যয়নে সচেষ্ট হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য হতে পারে:

নাজ ফাতেমা, বয়স-৩০, বিবাহিত একজন গৃহিণী। তিনি ২০০০ সালে বৈবাহিক সূত্রে ঢাকা আসেন। বিয়ের কারণে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ২০০১ সালে তাঁর প্রথম সন্তান এবং ২০০৩-এ দ্বিতীয় সন্তান হয়। তার স্বামী মিজানুর রহমান একজন বেসরকারী চাকুরিজীবী। নাজমা তার স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদের সাথে যৌথ পরিবারে বসবাস করেন। নাজমা বলেন: *আমি যখন প্রথম আসি আমি যে কী বেক্কল ছিলাম কী বলব তোমাকে, আমি কিছুই বুঝতাম না তখন। আর কেউ বোঝানোরও ছিল না। আমি চালাক হইছি বলতে পার আজ ৩ বছর ধরে। আমার বুদ্ধি খুলছে তখন, যখন আমি আমার মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা শুরু করি। মেয়েকে প্রথমে যখন কিন্ডার গার্টেনে দেই তখন খালি ভাবীদের কাছে থেকে শুনেছি আর মেয়েকে ঐভাবে লেখাপড়া করিয়েছি। ওখান থকে মনিপুর স্কুলের কথা আমি প্রথম শুনি। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে যে কোচিং করাতে হয় সেটিও ওখানে থেকে শুনেই ভর্তি করাই। মেয়ে চান্স পাওয়ার পর আমার কী যে ভাল লাগলো! মনে হলো, আমি যেন কোন এক যুদ্ধ জয় করলাম, আর এই যুদ্ধ জয়ের মূলে ছিল স্কুলের ভাবীরা। ওনাদের সাহায্য সহযোগিতাতে এটি সম্ভব হয়েছিল। মনিপুর স্কুলে মেয়ে ভর্তি করার পর আবারও ভাবীদের কাছ থেকে শুনে শুনেই আমার আক্কেল হয়। মেয়ের জন্য তো দশ বছর নিশ্চিত করলাম। এখন নিজের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। ভাবীরাই একদিন আলাপ করছিলেন, মেয়ে মানুষের জীবন নিয়ে, এক ভাবী আরেক ভাবীর কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, কি জীবন লেখাপড়াটা শেষ করতে পারিনাই, এখন ছেলে বড় হইছে ও আর আমাকে তেমন পাত্তা দেয় না।*

ওই ভাবীদের কথা শুনে আমার হুঁশ হয়, আরেক ভাবী তখন ওই ভাবীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য। এরপর আমি আর ঐ ভাবীর আরেক ভাবীর ভাইকে ধরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। আমি বি.এ-তে ভর্তি হই আর আমার সাথে যে ভাবী ছিলো উনি এইচএসসি-তে ভর্তি হন। যত যাই বলি না কেন, আমার মনে হয় জীবনটা এভাবেই কাটত যদি আমার সাথে স্কুলের ভাবীদের পরিচয় না হতো। আমি অনেক কিছু শিখেছি উনাদের কাছ থেকে। একেক জন একেক বিষয়ে এত এক্সপার্ট যে কী বলবো! যে কোন প্রয়োজনে আমি এখন আগে ভাবীদের সাথে আলোচনা করি।

ফাতেমার এই ঘটনাটি বিশ্লেষণে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, কীভাবে তার এই 'ভাবী সম্পর্ক' তার সামাজিক পুঁজি হিসাবে কাজ করছে। ফাতেমার পূর্বেকার জীবন এবং এই ভাবী সম্পর্কের নেটওয়ার্ক-পরবর্তী জীবনের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক যা বারংবার ফাতেমার কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। বাচ্চার স্কুলে নেয়ার বিষয়টি এখানে কেবল দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাই নয়। এটির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা সম্পর্ক ব্যক্তি জীবনযাপনের পদ্ধতিও বদলে দিতে পারে। যে সন্তান ও সংসারের জন্য ফাতেমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, সেটিও এই ভাবী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুনরায় গতি ফিরে পায়। এমনকি ফাতেমার নিজ আত্ম-উপলব্ধিতেও এই সম্পর্ক প্রভাব ফেলে। নিজ সত্তার অনুধাবনেও এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমি Bourdieu-র ন্যায় এই সামাজিক সম্পর্ককে দেখি 'social capital' হিসাবে যা কিনা অনেক বেশি অপ্রাতিষ্ঠানিক একটি সম্পর্ক হলেও অনেক বেশি প্রাধান্যপূর্ণ। এমনকি পারিবারিক ও সামাজিক অপরাপর সম্পর্কের তুলনায় এই সম্পর্ক অনেক বেশী কার্যকরী এবং গতিশীল। নারীর সাথে নারীর এই সম্পর্কের নেটওয়ার্ক নারীকে শুধু জীবন চলার পথই দেখায় না, জীবনের গতিকেও সঞ্চারিত করে। তাই বলা যায় যে, শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর সামাজিক পুঁজি নারীর এজেন্সি বৃদ্ধি করে, নারীকে তার নিজ সত্তার আত্মনির্মাণে স্ব-উদ্যোগী করে তোলে।

৫.২ নারীর আত্মনির্মাণে 'সাংস্কৃতিক' পুঁজির ব্যবহার

নারীর আত্ম গঠনের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হল তার নানাবিধ দক্ষতা ও যোগ্যতাসমূহ। নারীর নানাবিধ গুণাবলী নারীকে অন্যদের থেকে পৃথক করে তোলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই গুণাবলীর কারণেই নারী তার আত্মনির্মাণে সক্রিয় হয়ে উঠে। Bourdieu (2004) ব্যক্তির অর্জিত এই বিশেষ বিশেষ গুণাবলীকে 'cultural capital' বা সাংস্কৃতিক পুঁজি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। অন্যদিকে ব্যক্তির যে সকল বৈশিষ্ট্য সমাজে তার মান-মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে সেটিকে তিনি 'symbolic capital' বা প্রতীকী পুঁজি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী পুঁজির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নারীর ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়গুলো আরো প্রগাঢ়রূপে দেখা যায়। কেননা অনেক সময় নারীর এই সাংস্কৃতিক পুঁজি নারীকে তার সত্তার পুনর্নির্মাণে উদ্যোগী করে তোলে। যেমন তথ্যদাতা নূর তাজমিন বলেন:

> *আমার যখন ডিভোর্স হয় তখন আমি খুব ভেঙ্গে পড়েছিলাম। আমার পরিবার, ভাইবোন কোথাও আমার জায়গা হয় নাই সেভাবে। কেন ডিভোর্স হলো সে কথাও কাউকে বলতে পারতাম না। আমি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম...আমার গানই তখন আমাকে যেন আবার ফিরিয়ে আনে। আমার গানের ভুবনে আমি ফিরে যাই, আমাকে কম আর আমার গানকে বেশি ভালবেসেই আমার বর্তমান স্বামী আমাকে পছন্দ করেছিলেন। গানই আমার জীবনটাকে আবার যেন গুছিয়ে দিয়েছে।*

এ বক্তব্য হতে আমরা দেখতে পাই যে, নারীর সাংস্কৃতিক পুঁজি কীভাবে তার সত্তার আত্ম গঠনে একটি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাজমিন যখন তার ব্যক্তি জীবনের ঘটনার কারণে পরিবার এবং নিজ মনোজগতে একা হয়ে যান এবং নিজ সত্তার উপর ভিত্তি করে যখন সে তার আত্ম-পরিচিতি নির্মাণে উদ্যোগী হন তখন তাঁর সঙ্গীত প্রতিভাই তার আত্মনির্মাণের সাহস সঞ্চার করে। তাজমিনের কাছে আত্মপরিচিতি নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবেই কেবল তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা বিবেচিত হয় না, এটি তাঁকে তাঁর সামাজিক মান-সম্মান ও মর্যাদাকেও ফিরিয়ে দেয়। অর্থাৎ তাঁর সাংস্কৃতিক পুঁজি তাঁকে স্বাবলম্বীই করে না, সমাজে তাঁর অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে তোলে।

৬. উপসংহার

প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই তার নিজ পরিমণ্ডলে সক্রিয়তাকে ধারণ করে। তবে ব্যক্তি, সত্তা ও মানুষভেদে এজেন্সির বোধ ভিন্ন ভিন্ন (Taylor 1985) ব্যক্তির এই এজেন্সির ব্যবহার ও প্রায়োগিকতার সূত্র ধরে সে তার সত্তার আত্ম প্রত্যয়নে সচেষ্ট হয়। ঠিক একইভাবে ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত নারীর সত্তা গঠনে তার এজেন্সি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। নারীর সক্রিয়তা নারীকে শুধু তার আত্ম নির্মাণে প্রভাবিতই করে না ক্ষেত্র বিশেষে তাকে প্রলুব্ধও করে থাকে। আর নারীর এই এজেন্সির অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসাবে কাজ করে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজিসমূহ, যা নারীকে তার আত্মপরিচিতি হতে শুরু করে আত্ম-অনুধাবনের উৎসাহ যোগায়। নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী পুঁজির ব্যবহার নারীকে তার ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে প্রতিস্থাপিত করে এবং তার প্রেক্ষিতে সে তার ব্যক্তিসত্তাকে খণ্ডনের ও পুনর্খণ্ডনের মধ্য দিয়ে নিজ আত্ম প্রত্যয়নে সচেষ্ট হয়ে উঠে।

টীকা

১। 'Agency' প্রত্যয়টি আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করা আমার মতে সমস্যাজনক। তবে ব্যক্তি-ক্রিয়তাকে এজেন্সি শব্দটি দ্বারা অনুধাবন করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। এজেন্সি মূলত ব্যক্তি কর্মক্ষমতা ও স্ব-নির্ধারণী ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে থাকে।

২। 'সামাজিক পুঁজির' ধারণাটি ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জ্ঞানকান্ডের ভিন্নতায় সামাজিক পুঁজির ধারণা ভিন্ন হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামাজিক পুঁজিকে দেখা হয়েছে

সরকার, রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যদিয়ে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে সামাজিক সম্পর্ককে সামাজিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানে সাধারণত এটি বুর্দ্যোর 'social capital' ধারণার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩। এটি মূলত বুর্দ্যোর 'cultural capital' ধারণা হতে উৎসারিত একটি প্রপঞ্চ। সাধারণত 'cultural capital' ধারণাটির সমার্থক হিসেবে সাংস্কৃতিক পুঁজির সজ্ঞায়ন করা হয়ে থাকে। ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ গুণাবলী, কর্মদক্ষতা তাকে সাংস্কৃতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এসব ব্যক্তিক যোগ্যতাকেই সাধারণত সাংস্কৃতিক পুঁজি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৪। এখানে আমি 'structuration process' এর অনুবাদ হিসেবে 'কাঠামোকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেছি। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত *Central Problems in Social Theory* গ্রন্থে এনথনি গিডেন্স 'কাঠামোকরণ' ধারণার মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম এজেন্সি ধারণাটি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ব্যক্তি মাত্রই কাঠামোকরণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামো ব্যক্তিকে এমন পরিসরে নির্মাণ করে যে, ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে সামাজিক কাঠমোর ন্যায় তার ক্রিয়াকে পরিচালনা করতে তৎপর হয়ে উঠে।

৫। 'Structuration' বলতে গিডেন্স মূলত সমাজ কাঠামোর কাঠামোকরণ প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করেছেন। যেখানে ব্যক্তি সমাজ কাঠামো অনুসারে নিজ ক্রিয়া সম্পাদনে উৎসাহী থাকেন। এখানে আমি 'structuration' এর অনুবাদ হিসেবে 'কাঠামোকরণ'কে ব্যবহার করেছি। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন Giddens 1979।

৬। অর্টনার মূলত তাঁর আলোচনায় 'intentionlity' প্রত্যয়টি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির এজেন্সিকে চিহ্নিত করেন। 'Intentionlity' বলতে তিনি ব্যক্তির স্বপ্রণোদিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নির্দেশ করে থাকেন। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার ক্রিয়ার সম্পাদনে সক্রিয় হয়ে উঠে।

৭। 'Alienation' প্রত্যয়টি দ্বারা মূলত বিচ্ছিন্নতাকে চিহ্নিত করা হয়। মার্ক্সীয় চেতনায় শ্রমিকের উৎপাদনের উপায় হতে যে বিচ্ছিন্নতা সেটিকে এলিয়েনেশন প্রপঞ্চটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়। তবে নারীর ক্ষেত্রে এ প্রপঞ্চটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তথ্যপঞ্জী

Bourdieu, P. 1977. *Outline of a theory of practice.* Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Giddens, A. 1973. *The Class Structure of the advanced societies.* London: Hutchinson.

Giddens, A. 1979. *Central prolems inSocial Theory: Action, Structure & Contradiction in Social Analysis.* Berkley: University of Califonia Press.

Islam, F. Women, Employment and Family: Poor Informal Sector Women Worker in Dhaka City. Unpublished Ph.D thesis at the University of Sussex.

Lughod, A. 1996. The Romance of Resistance: Tracing Transformations through Bedouin Women. *American Ethnologist*, 17: 41-55

Marx, K. 1844. *The Economic & philisophic Manuscripts*. New York: International Publishers.

Ortener, Sherry B. 1974. Is Female to Male as Nature is to Culture? In M. Z. Rosaldo and L. Lamphere. eds., *Woman, Culture and Society*, pp. 67-87. Stanford: Stanford University Press.

Ortner, Sherry B. & Whitehead, H. eds. 1981. *Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality*. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

Ortner, Sherry B. 1996. *Making Gender: The Politics and Erotic of Culture*. Beacon Press.

Ortner, Sherry B. 2003. *New Jersey Dreaming: Capital, Culture, and the Class*. Durham: Duke University Press.

Ortner, Sherry B. 2006. *Anthropology & Social Theory: Culture, power & the Acting Subjuct*. Durham & London: Duke Uneversity Press.

Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. London: Yale University Press.

Sen, A. 1990. Gender and Cooperative Conflicts. In Irene Tinker. ed., *Persistent Inequalities*. New York: Oxford University Press.

Sen, A. 1996. Agency and Well-Being: The Development Agenda. In N. Heyzer et al., eds., *A Commitment to the World's Women*, New York: UNIFEM.

Taylor, C. 1985. What is Human Agency?. In *Human and Language: Philosophical Papers*. Cambridge: Cambridge University Press.